সামনে ইতিহাস

সুমন চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

সাংবাদিকদের বিভিন্ন ধরনের কাজে অভ্যস্ত হতে হয়। যেমন রিপোর্টিং, এডিটিং, উত্তর-সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখা ইত্যাদি। এর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন কাজ হল কোনও ব্যক্তির ইন্টারভিউ নেওয়া। কঠিন আবার মজাদারও বটে। অনেকটা কোনও অনিচ্ছুক সুন্দরীকে প্রলুব্ধ করার মতো। নামীদামি লোকেদের কথা বিভিন্ন সময়ে সংবাদপত্রে, টিভিতে দেখা যায়। কিন্তু সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাঁদের মনের ভিতর থেকে না-জানা কথা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করার মজাই আলাদা। কুড়ি বছরের সাংবাদিক জীবনে সব ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা হয়েছে। মাঠেঘাটে ঘুরে রিপোর্টিং করেছি, প্রাসঙ্গিক নানা বিষয়ে নিবন্ধ লিখেছি। কিন্তু সবচেয়ে উপভোগ করেছি নামীদামি ব্যক্তিদের ইন্টারভিউ নিয়ে। তাঁদের মুখ থেকে না-জানা তথ্য বের করে। দেশ-বিদেশের নানা ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছি। রাজনীতিক, সাহিত্যিক, অর্থনীতিবিদ ইত্যাদি বিবিধ পেশায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁদের চিন্তাভাবনা, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে মানুষের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এই সংকলন গ্রন্থে এমনই ছয় ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার আছে যাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত তো বটেই, কেউ কেউ আবার বিতর্কিতও। এই রকম এক বিতর্কিত মনীষা নীরদ সি চৌধুরী তাঁর লন্ডনের বাসভবনে দু'দিনের বৈঠকি আলাপে এমন সব ক্ষুরধার কথা বলেছেন যা বঙালির চেতনাকে চমকে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সুদূর জার্মানিতে উড়ে গেছি নেতাজির কন্যা অনিতার সাক্ষাৎকার নিতে। বাঙালির প্রিয় নেতার এই কন্যার কথনে ধরা পড়েছে তাঁর পিতা-মাতা এবং বসু পরিবারের অনেক অকথিত কাহিনী নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার পর মায়ানমারের গৃহবন্দিনী নেত্রী অং সান সু চি সারা বিশ্বের নজর কেড়ে নেন। মায়ানমারে এক সন্ধ্যায় তিনি এক একান্ত সাক্ষাৎকারে আমাকে স্মরণ করিয়ে দেন ভারত-মায়ানমারের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য, ভারত সম্পর্কে তাঁর আশা এবং নিরাশার কথা। প্রতিবেশী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় গণভবনে বসে তাঁর দেশের বিবিধ সমস্যা এবং ভারতের প্রতি তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা জানান। ১৯৮৭-র রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে এ রাজ্যে সফরে এসেছিলেন রাজীব গাঁন্ধী। শ্রান্ত-ক্লান্ত রাজীবকে ধরি হেলিকপ্টারের মধ্যেই। পশ্চিমবঙ্গ, কংগ্রেস, সি পি এম ইত্যাদি বহু বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয়। যথাযথভাবে সেগুলি লিপিবদ্ধ করেছি। এবং অবশ্যই আছেন জ্যোতি বসু। ইজরায়েল, লন্ডন, আমেরিকায় নেওয়া বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে জ্যোতি বসুকে পাওয়া গেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন আদলে। খোলা মনে, অকপটে তিনি জানিয়েছেন তাঁর নিজের দল, বিরোধী দল, শিল্পায়ন, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি বহু বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞ মূল্যায়ন। এই সবকটি লেখা আনন্দবাজার, দেশ পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। সবগুলি একত্র করে এই গ্রন্থে সংকলন করা হল।

এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকেছেন শেখর রায়। স্কেচগুলি এঁকেছেন অনুপ রায়। এঁদের এবং যে সব সহকর্মী বইটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সুমন চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা বইমেলা, ২০০১

সূ চি প ত্র

নীরদচন্দ্র চৌধুরী ৯

অনিতা পাফ..... ৪৫

শেখ হাসিনা ৯৫

অং সান সু চি ১১৭

জ্যোতি বসু ১২৯

রাজীব গান্ধী ১৭৯

বাঙালি আত্মঘাতী

সতেরো অক্টোবর, দুর্গা পুজোর সপ্তমীর দিন বিকেলে পাঁচটা নাগাদ অক্সফোর্ডের লাথ বেরি রোডে তাঁর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছই। একটা লম্বা লোহার সিঁড়ি বেয়ে জানলার কার্নিশের উপর উঠে গোলাপের ডাঁটি ছাঁটছিলেন তখন তিনি। পরনে ধুতি আর হাল্কা রঙের গরম পাঞ্জাবি। নীরদচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়, গত তেইশে নভেম্বর যিনি বিরানব্বই-এ পা দিয়েছেন।

তাঁর নিজের কথাতেই, মানুষ নীরদচন্দ্রের বয়স একানব্বই হলেও, লেখক নীরদচন্দ্রের বয়স মাত্র চল্লিশ। অতএব দু'হাতেই যেন তিনি লিখে চলেছেন। আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড ''দাই হ্যান্ড গ্রেট অ্যানার্ক' নিয়ে পশ্চিম জোড়া মাতামাতি স্তিমিত হওয়ার আগেই তিনি তন্ময় হয়ে তিন খণ্ডে বাঙালির ইতিহাস লিখতে শুরু করে দিয়েছেন, যার প্রথমটি (নাম : আজি হতে শতবর্ষ

আগে) খুব শীঘ্রই কলকাতায় প্রকাশিত হবে। আর খবর : এর পরেও আরও দুটি ইংরেজি বই এবং আরও একটি বাংলা বই লেখার ইচ্ছে আছে তাঁর। এই বয়সে কী করে পারেন জানতে চাইলে নীরদবাবুর নির্লিপ্ত জবাব : "কাজ-ই যদি করতে না পারি তা হলে এই বয়সে বেঁচে কী লাভ? অলস হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে তো গলায় দড়ি দেওয়া অনেক ভাল।"

নীরদবাবুকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন, তাঁরা সকলেই জানেন, ভাল ভিনটেজ ওয়াইন তিনি যতটা পছন্দ করেন, প্রায় ততটাই পছন্দ করেন কথা বলতে। সেই সংলাপের তোড় সম্ভবত নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বেগকেও হার মানায়। কিন্তু তাঁর কথা কেউ রেকর্ড করুক, নীরদবাবুর তাতে প্রবল আপত্তি। "দুটো জিনিস আমি একদম পছন্দ করি না। টেপ রেকর্ড আর ক্যামেরা। বুঝলে হে?"

তবু মাঝে মাঝে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। যেমন এ ক্ষেত্রে হয়েছে। তবে দ্বিতীয় দিনে। প্রথম দিন পাক্কা আড়াই ঘণ্টা ছিলাম তাঁর কাছে। বেশিরভাগ সময় ধরেই তিনি "আত্মঘাতী বাঙালি"-র পাণ্ডুলিপি থেকে নির্বাচিত অংশ পড়ে শোনালেন। কখনও বসে, কখনও দাঁড়িয়ে, আবার কখনও পায়চারি করতে করতে। পড়তে পড়তে তিনি যতটা উত্তেজিত, শুনতে শুনতে আমরাও প্রায় ততটাই। এবং হয়ত সেটা লক্ষ করেই নীরদবাবু বললেন, "এই বইটা আমি তোমাদের মতো অল্পবয়স্ক পাঠকদের দিকে তাকিয়েই লিখছি। বুড়োদের উপর আমার বিশেষ ভরসা নেই। বুড়োদের মতো পাজি, নচ্ছার খুব কম-ই হয়।"

আর দ্বিতীয় দিনে পাওয়া গেল সাক্ষাৎকার। ওই টেপ রেকর্ডারেই। পুরো দেড় ঘণ্টা। কখনও হেসে, কখনও রেগে, আবার কখনও দারুণ উত্তেজিত হয়ে সব প্রশ্নেরই জবাব দিলেন তিনি। প্রসঙ্গ বাঙালি, বাংলাদেশ। বাঙালির অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। গত আঠারো বছর বিলেত-বাসী নীরদবাবুর মনের গভীর গোপন কোণে এখনও আশা, বাঙালি আবার জাগবে। ঠিক যেমন আজি হতে শতবর্ষ আগে জেগেছিল।

প্রশ্ন : আপনি এই যে নতুন বইটি লিখছেন, তার ভাবনা চিন্তা কবে শুরু হয়েছিল? এত দেরিতেই বা বইটি লেখায় হাত দিলেন কেন?

জবাব : বইটি লেখার কথা কবে মাথায় ঢুকল? সে ১৯২০ সালে বলা চলে। আমি কোনও দিন বই লিখবার জন্য বই লিখিনি। লেখক হবার জন্য লেখার কথাও কোনও দিন ভাবিনি। আসল কথা হল, আমার কোনও বক্তব্য আছে কি না। আমার সারা জীবনের একটা অনুভূতি ১৯২০ সাল থেকে হয়েছে। সেই অনুভূতির কতটুকু আমি জানাব, সেটা বরাবর ভাবনা-চিন্তা করছি। এই যে নতুন বইটা আমি লিখেছি, তাতে বাংলাদেশের বা বাঙালি জাতির জীবন সম্পর্কে যে সব কথা আছে, তা আমি প্রথম আবিষ্কার করি ১৯২৫ থেকে ১৯৩৫-এর মধ্যে। তখন থেকেই কিছু কিছু বাংলায় লিখেছি। তবে ঠিক এরকম করে লিখিনি। কেন আমি বাংলায় লিখিনি? ১৯৩০-৩২ সালের পর থেকেই আমার ধারণা জন্মাল, বাংলা ভাষা বা বাংলা সাহিত্যের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। তা হলে আমি সময় নষ্ট করি কেন? ভারতবাসীর কাছে যদি বলতে হয়, বাঙালির কাছেও যদি বলতে হয়, বাইরের জগতের কাছেও যদি বলতে হয়, তা হলে আমি ইংরেজিতে লিখে সকলের কাছে যেতে পারব। খালি বাঙালির কাছে বললে বাঙালি শুনবেও না বুঝবেও না, কিছু করবেও না। সুতরাং বাংলায় লিখে কোনও লাভ নেই। শেষ বাংলা লেখা আমার ১৯৩৭ সালে বেরোয়। এর পরে আর বাংলা লিখিনি। যখন ১৯৬৫-র পরে গজেনবাবু আমাকে বাংলায় তো লিখতে বললেন, আরম্ভ করে দেখলুম, যে চলে যায়নি, আসে এখনও বাংলা লেখা। তাই তে, দু-চারটে প্রবন্ধ লিখবার পর, "বাঙালি জীবনে রমণী" বইটা লিখে ফেললুম। যখন ওটা লিখলুম তখন সর্বদাই ধারণা ছিল, ওটাতে আছে বাঙালি জীবনে রমণীর আবির্ভাব। প্রকাশটা তো বাকি রইল। তখন থেকেই আমার ধারণা ছিল, আরও একটা বই আমায় লিখতে হবে, যাতে নাকি এটার প্রকাশ যেটা হল পুরো। আর তার পরে লিখব পড়ে গেল। সবই লিখব ভেবেছিলাম। তা এইটেতে যেটা দেখিয়েছি সেটা হল প্রকাশটা বলা চলে। তবে এটা খালি রমণী নয়, প্রধান কথা রমণী বটে। কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের

১৯৩০-৩২ সালের পর আমার ধারণা জন্মাল, বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। তা হলে আমি সময় নষ্ট করি কেন?

সম্পর্ক খুব বড় একটা কথা। এর একটা অন্য কারণ আছে। কী জন্যে বলেছি, স্ত্রী-পুরুষের কথা, বলছি। এটাতে আমাদের ধর্মীয় অনুভূতি, নৈতিক জীবনের অনুভূতি, সবই আছে। সুতরাং এইটে লিখবার ধারণা বরাবরই ছিল, কী বলব তাও স্পষ্ট আমার মনে ছিল। আর আমি একটা বই লিখব বলে চিন্তা করতে আরম্ভ করিনি। সারা জীবন যেটা নিয়ে চিন্তা করেছি, সব চেয়ে বেশি অনুভব করেছি, তাই নিয়ে যখন সময় হবে লিখব ভেবেছিলাম। কিন্তু মুশকিল এই হল, এখানে এসে অবধি আমি ইংরেজি বই নিয়ে ব্যস্ত। সুতরাং ধরবার অবকাশ হয়নি। এই বইটাতে আমি লিখেছি, যে ১৯৬৭ সালে, ৭০ বছর বয়স হলে আমি প্রথম বাংলা বই লিখি। আজ আর ৯০ বছর বয়সে লিখছি দ্বিতীয় বাংলা বই। এই কুড়ি বছর ধরে লেখা হয়নি, লিখবার ইচ্ছে ছিল না বলে নয়। লিখব জানি, কিন্তু অবকাশ ঘটেনি। অ্যাদ্দিন পরে এটা লিখেছি। এটা হল প্রথম খণ্ড। তার পর লিখব দুই খণ্ডে "আত্মঘাতী বাঙালি"।

প্রশ্ন : প্রথমটা তো হল "আজি হতে শতবর্ষ আগে।"

জবাব : হ্যাঁ। মানে তখন আমাদের জীবনটা যে রকম ছিল, যা থেকে অবনতিটা আরম্ভ। দ্বিতীয়টাতে আমি দেব যে বাঙালির চরিত্রে, জীবনে অন্তর্নিহিত যে সব দুর্বলতা ছিল সেগুলো কী? যার দরুন প্রায় পতনটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াল। ওটা তখনও ছিল। আমি বললুম এই দুটো লড়াই সমস্ত ঊনবিংশ শতক জুড়ে চলেছে। কিন্তু জিতেছে নতুন। ১৯২০ সালের পর থেকে "নতুনটা" হার মানতে আরম্ভ করল। বাঙালির জীবনীশক্তির যেন একটা ক্ষয় হল। সঙ্গে সঙ্গে আগাছার মতো নীচে থেকে পুরনোগুলো আবার উঠে এল। তৃতীয়টাতে ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪৭-এর মধ্যে কী হয়েছিল, তার একটা ইতিহাস দেব আর তার পরে আজকালকার অবস্থার মোটামুটি সংক্ষিপ্ত একটা ধারণা দেব। কিন্তু যেটার উপর আমি বেশি জোর দিই, সেটা হচ্ছে, বক্তব্য উপস্থাপনা নয়, অনুভূতিটা। যেমন, লেখাটা পড়ে যদি মনে না হয়, ওই জীবনের আবেগটা যেন আমি অনুভব করছি, তা হলে আমার লেখা ব্যর্থ হবে। আমি মনে করি যে এ রকম একটা মানসিক জীবন ছিল, তা কল্পনা করাও আজকের পক্ষে দুরূহ। অনেকে

হয়ত অবিশ্বাসও করবে। অথচ আমি একেবারে সত্য ঘটনা বলছি। আর পরেরগুলো, ওটার দ্বারা যদি মনের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা না হয় যে আমাদের এই তামসিক অবস্থা থেকে উঠতে হবে, তা হলেও ব্যর্থ লেখা। আমার বক্তব্য হচ্ছে যতটা না যুক্তি, তর্ক, তথ্য, এ সব না বলা, তার চেয়েও মানসিক একটা প্রেরণা, যারা পড়ছে তাদের। আর সর্বদাই মনে রাখবে যে অনুভূতি আগে আসে, উপলব্ধি পরে। উপলব্ধির উপর আমি তত জোর দিই নে। অনুভূতি যার আগে না এসেছে, কখনও পুরোপুরি উপলব্ধি হয় না। অনুভূতি আর উপলব্ধি, একটার পরে আর একটা; কিন্তু অনুভূতি যদি প্রবল না হয়, প্রখর না হয়, উপলব্ধিও খুব গভীর হয় না।

প্রশ্ন : আজ হতে শত বর্ষ আগে বাঙালির যেটা ওঠার সময়.....।

জবাব : ওঠার সময় নয়। উঠে গিয়েছে। উঠে গিয়ে অবস্থাটা কী দাঁড়াল তাই।

প্রশ্ন : হ্যাঁ। সেই চিত্রটা সংক্ষেপে যদি আমাদের বলেন।

জবাব : সেই চিত্রটা অনেক বড়। তবে এইটুকু বলে দিই, একটা অদ্ভুত, যে মানসিক জীবনটাই আর সাধারণত যে জীবনটার কথা আমি বলতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে সাধারণ অবস্থার একটা ভাবুক ব্যাপার। বৈষয়িক ব্যাপার নয়। বৈষয়িক বাঙালি মোটেই নয়। বৈষয়িক বাঙালি বড় কিছু করেইনি। আমার বক্তব্য হচ্ছে, আপন-ভোলা বাঙালি ভিন্ন কোনও বাঙালির কাজ স্থায়ী হয়নি। চৈতন্যদেবের সময় থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত কেউ হয়নি। পণ্ডিতরা চৈতন্যকে গালিগালাজ করেছে। যে পাগল একটা, মাতাল একটা, কেবল নাচানাচি করে। সুতরাং আমাদের কীর্তিটা বৈষয়িক নয়। আর বৈষয়িকভাবে বড় হওয়ার ক্ষমতা বাঙালির খুব কম। সে জন্য বাঙালি যদি মানসিক জীবন ছেড়ে বৈষয়িক কেবল জীবনের দিকে যায় সে ধর্মভ্রষ্ট হয়। এইটা হল কথা আমার।

বিভূতিবাবু পথের পাঁচালি-তে যে জীবনটা এঁকেছেন, সেটা হল গিয়ে অতি সহজ, সরল গ্রাম্য জীবনের। আমি বলেছি, সেটার আবার একটা আর্থিক দৈন্য আছে।

প্রশ্ন : আপনার মতে এই বিকাশ সম্ভব হয়েছিল কেন? কীভাবে?

জবাব : বলছি। এইটেই আমি প্রথম আবিষ্কার করি। ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হওয়ার আগে হিন্দু সভ্যতার সঙ্গে